প্রথম অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ

(SWAMI VIVEKANANDA)

উপস্থাপনা—আধ্যাত্মিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী যে মনীষী সারা বিশ্বের সামনে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও মানবতাবাদী ভাবনা তুলে ধরেছিলেন, তিনি আমাদের বাঙালী ও ভারতীয়দের গর্ব ও অহঙ্কারের সম্পদ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছিল ভারতের সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থানের চেতনা থেকে। সেই সময়ের কিছু সামাজিক অমঙ্গলও তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল যার কারণ হিসেবে আধ্যাত্মিক মূল্যে বিশ্বাস বা আস্থা হারিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। তাই তিনি আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন।

প্রাচীন হিন্দুদর্শনের বিশেষতঃ বেদান্তের এক গভীর প্রভাব তাঁর উপর লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাঁর চিন্তা চেতনা বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্র মূলতঃ উপনিষদ এবং বেদান্তের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। তবে কালের দাবী ও প্রয়োজনে বেদান্তের নব-ব্যাখ্যার দরকার বলেও তিনি মনে করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ক্ষমা, সহনশীলতার নীতি তাঁকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। আবার গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব তাঁর সমস্ত কর্মের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। সমস্ত জীবের প্রতি প্রেম ও সেবাকে শুধু নিজের জীবনেরই নয়, সব মানুষের জীবনের আদর্শ হিসেবে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বাধীনতাকে আত্মার সারধর্ম বলে মনে করতেন। এটি এমন এক গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা আত্মার মধ্যে থাকে না, বরং আত্মাই স্বরূপতঃ স্বাধীনতা। তবে 'স্বাধীনতা' বলতে তিনি নিয়ন্ত্রণহীনতা না বুঝিয়ে আত্মনির্ধারণ বা স্বনির্ধারণকে বুঝিয়ে ছিলেন। আত্মা সর্বদাই স্বাধীন, আত্মার যে বন্ধনের কথা বলা হয় তা নিছকই অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার জন্য। আত্মা যদিও অমর, তবু তার অমরত্বের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আত্মার অমরত্বের পাশাপাশি তিনি পুনর্জন্ম-বাদেও বিশ্বাসী ছিলেন। অমরত্বের অন্য একটি দিকই হল পুনর্জন্ম। আত্মার অমরত্বের উপলব্ধি হলে জন্ম ও পুনর্জন্মের চক্রের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে যখন মানুষ জন্ম ও পুনর্জন্মের উর্দ্ধে উঠতে পারে তখনই সে অমরত্ব লাভ করে। আমাদের জন্ম কর্মের দ্বারা চালিত। তিনি জীবন্মুক্তি তত্ত্বেও বিশ্বাসী ছিলেন। আত্মার অমরত্বলাভের পথ বা উপায় কি? এক কথায় এর উত্তর হল যোগ। 'যোগ' এক ধরনের শৃঙ্খলা বা অনুশাসন। তবে তিনি একটি মাত্র যোগের কথা বলেননি। আত্মার অমরত্ব চার ধরনের যোগের সমন্বয়েই লাভ করা যায়, যারা পরস্পরের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বা বিরোধী না হয়ে একে অপরের পরিপূরক। এই যোগ আসলে এক এক

ধরনের পন্থা, তাই এই চারটি পন্থার সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি অনুভব করেছিলেন। এগুলো হলো—(ক) জ্ঞানযোগ (খ) ভক্তিযোগ (গ) কর্মযোগ এবং (ঘ) রাজযোগ। ভারতীয় দর্শনে মুক্তি বা মোক্ষের যে বিভিন্ন পথের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির উল্লেখ দেখা যায়। এই দিক থেকে দেখলে বিবেকানন্দ সনাতন ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে সহমত হয়ে প্রতিটির সঙ্গে 'যোগ' শব্দটি যুক্ত করে সম্ভবতঃ এটিই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এগুলো আসলে এক ধরনের শৃঙ্খল বা অনুশাসন।

বিবেকানন্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিবেকানন্দের নিম্নোক্ত ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করবো—

মানুষের স্বরূপ
(Nature of Man)

স্বামী বিবেকানন্দ একজন মানবতাবাদী হিসেবে বিশ্বে পরিচিত, সমাদৃত। তিনি এমন এক মহান মানব ছিলেন যার হৃদয় আলোড়িত হত, যিনি মানুষের দুঃখ-বেদনায় গভীরভাবে ব্যথিত হতেন। একজন যথার্থ মানবপ্রেমী হিসেবে তিনি শুধু এইসব দুঃখ-কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করেননি, কিভাবে এর সমাধান নিশ্চিত করা যায় তার জন্য নানা পথ ও পন্থার খোঁজ করেছিলেন।

মানুষের স্বরূপ কী ঃ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিবেকানন্দ বিভিন্ন চিন্তাবিদদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, আদিম যুগের মানুষ সম্পর্কে কিছু ধারণাগত ত্রুটি রয়েছে। স্বপ্ন, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়গুলো রহস্যময় থাকার দরুণ ভ্রাম্যমান জীবনে অভ্যস্ত এই আদিম মানুষগুলোকে শুরুতে প্রকৃত মানুষ বলে গণ্য করা হয়নি। তবে পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের চিন্তার সামর্থ, অনুমান করার ক্ষমতা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকায় এই ধারণার বদল ঘটে। তাই তিনি একে উপনিষদের প্রধান অনুসন্ধানের বিষয় বলে গণ্য করেছেন। তিনি তাঁর 'জ্ঞানযোগ' নামক বইতে লিখেছেন ঃ "কঠোপনিষদ তার অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে এই প্রশ্ন দিয়ে যে, যখন একজন মানুষ মারা যায় তখন একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়; কারণ একদল মনে করে যে মানুষটি চিরকালের জন্য চলে গেল। অন্য একটি দল মনে করে মারা গেলেও সে চিরন্তন—এর মধ্যে কোন্ ধারণাটি সত্য?" বিবেকানন্দের মতে মানব জাতির ক্ষেত্রে দুটি অবস্থান রয়েছে—একটি হল শূণ্যবাদীদের সঙ্গে সহমত হয়ে বিশ্বাস করা যে, আমরা কোন কিছুই জানি না; আমরা ভূত-ভবিষ্যৎ এমনকি বর্তমান সম্পর্কেও কিছু জানি না। অন্য একটি অবস্থান হল— এর একটি ব্যাখ্যা চাওয়া; বাস্তবকে (real) খোঁজা। এই দেহের মধ্যেই তো জড়ের অণু-পরমাণুর সমষ্টি রয়েছে; বাস্তব বা যথার্থ তত্ত্ব বলে কি কিছু রয়েছে? বিবেকানন্দ নিজের মতো করে এই যথার্থ তত্ত্বকে খুঁজেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই যথার্থ তত্ত্বের অর্থাৎ মানুষের অন্তঃস্থিত প্রকৃতি আসলে আধ্যাত্মিক শক্তির (spiritual energy) সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর মতে মানুষ আসলে একটি আত্মা (spirit)।

ইংরেজী 'spirit' শব্দের ইতিবাচক ও নেতিবাচক—এই দু-ধরনের তাৎপর্যই রয়েছে। নেতিবাচক তাৎপর্য হল, আধ্যাত্মিক বলতে সাধারন (ordinary) কোনো কিছু বোঝায় না বরং যা কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ তার থেকে এর ভিন্ন কিছু বোঝায়। 'আধ্যাত্মিক' কথাটির এই অর্থ বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন নি। দৈহিক বৈশিষ্টসম্পন্ন রূপে মানুষ আবির্ভূত হলেও, সে শুধুমাত্র দেহসর্বস্ব নয়। তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির সমন্বয়ও রয়েছে। বিবেকানন্দের মতে মানুষ ইতিবাচক দিক দিয়েও আধ্যাত্মিক—কারণ সে এমন কিছু প্রত্যাশা ও আকাঙ্খার দাবীদার যা কেবলমাত্র মানুষেরই থাকতে পারে। তিনি মানুষের এই আধ্যাত্মিক স্বরূপের উদ্‌ঘাটনে অনেকখানি সময় ও শক্তি ব্যয় করেছিলেন। আবার আধ্যাত্মিকতার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়ায় মানুষের দৈহিক দিকগুলিও আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন হয়ে পড়েছিল।

মানুষের ভৌত প্রকৃতি (The Physical Nature of Man) ঃ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যে, মানুষ দুটি সত্তা দিয়ে গড়া। বিবেকানন্দ এই দুটি সত্তার নাম দিয়েছেন—ভৌত সত্তা ও আধ্যাত্মিক সত্তা। এই দুটি সত্তার সুসংহত রূপ হল মানুষ। অনেক চিন্তাবিদই মানুষের ভৌত সত্তাকে ছোট করে দেখেছিলেন। একে পশুসুলভ প্রবৃত্তিময় সত্তা হিসাবে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ এই ভৌত সত্তাকে মূল্যহীন, নিকৃষ্ট, নিম্নস্তর প্রভৃতি বলতে চাননি। এই সত্তার গুরুত্ব কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। যখন উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত-র কথা বলা হয় তখন আধ্যাত্মিক সত্তার জাগরণের কথাই বলা হয় এবং তার থেকেই বোঝা যায় যে মানুষের মধ্যে তার আর একটি সত্তা রয়েছে যা আধ্যাত্মিক সত্তা থেকে আলাদা অথচ তার আধ্যাত্মিক সত্তার সদৃশ। এটিই হল তার ভৌত সত্তা (physical self)।

মানুষের ভৌত সত্তার মধ্যে রয়েছে তার দৈহিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি। সঠিক অর্থে দেহই হল ভৌত সত্তা। যদিও বিবেকানন্দ কখনও কখনও সূক্ষ্ম দেহ (subtle body) ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে অন্যান্য দেহ কেন্দ্রের কথা উল্লেখ আছে তাকেই দেহ বলেছেন। তবে সাধারণভাবে মানুষের ভৌতসত্তাকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যদি স্থূল দেহের (gross body) গঠন, কার্যাবলী ও গুরুত্ব ভালোভাবে বোঝা হয়।

বিবেকানন্দের এই বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, অন্যান্য সত্তার তুলনায় মানুষের ভৌত সামর্থ্য শ্রেষ্ঠতর। এর মানে একথা নয় যে, অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় তার আরও বেশী শক্তি রয়েছে। অনেক প্রাণীই শক্তি ও নিছক পাশবিক সক্ষমতায় মানুষের থেকে অনেক বেশী শক্তিমান; অনেকেরই সূক্ষ্ম ও তীব্র ইন্দ্রিয়াভূতি রয়েছে। তবুও তাদের তুলনায় মানুষ শ্রেষ্ঠতর এই কারণে যে, তার ভৌত সত্তা অনেক বেশী সুসংহত। অনেক বেশী বৃহত্তর ঐক্য তার মধ্যে দেখা যায়। পরিবেশ গত উপাদানের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া নিছক প্রবৃত্তিমূলক বা যান্ত্রিক নয়। মানুষ কেবল প্রতিক্রিয়াযুক্ত দেহ নয়, এমনকি তার দৈহিক আচরণের মধ্যে সাধারণত একটি পরিকল্পনা ও ছাঁদ (pattern) লক্ষ্য করা যায়। ভৌত উদ্দীপকের প্রতি তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও উদ্দেশ্য ও নির্বাচনমূলক অর্থ দেখা যায়। দেহের মধ্যে মস্তিষ্কতন্ত্র থাকায়

মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে সহজেই আলাদা করা যায়। শুধু তাই নয়, এই তন্ত্র মানুষকে প্রাণীজগতে আলাদা মর্যাদা প্রদান করেছে, মানুষের মননশক্তি তাকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।

মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা (The Spiritual Nature of Man) ঃ ভৌত সত্তা ও আধ্যাত্মিক সত্তা মিলিয়েই একজন সম্পূর্ণ মানুষ। মানুষের ভৌত সত্তা মোটেই মূল্যহীন নয়। তবে তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতির জন্য তার দৈহিক সত্তার অনন্যতা সম্ভব হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে বিবেকানন্দ মানুষের ভৌত সত্তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন নি তবে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে এই সত্তা মানুষের নিকৃষ্টতর দিকটিকেই তুলে ধরে। মানুষের প্রকৃত সত্তা হল তার আধ্যাত্মিক সত্তা যা তাকে তার ভৌতসত্তাকে অতিক্রম করে যেতে সাহায্য করে। মানুষের এই প্রকৃত বা যথার্থ সত্তাকে বিবেকানন্দ 'আত্মা-শক্তি' (soul force) বা 'আত্মা' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি স্বাধীনভাবে এই আত্মার বর্ণনা দিতে গিয়ে বেশ কিছু অতিরঞ্জিত বিবরণের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে দেখা যাচ্ছে যে গীতাকে অনুসরণ করে তিনি লিখছেন—"এই আত্মা সকল চিন্তার অতীত - যার জন্ম বা মৃত্যু নেই, যাকে অস্ত্র ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না; যাকে বাতাস শুষ্ক করতে পারে না, জল গলাতে পারে না। অনাদি, অনন্ত, অস্পৃশ্য, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান এই সত্তা; যা দেহও নয় বা মনও নয়- এ সবের অতীত"। গীতাতে আত্মার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শ্বাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।"

অর্থাৎ এই আত্মার কখনও জন্ম হয় না, মৃত্যুও হয় না। আগে অনস্তিত্বশীল থেকে পরে এটি অস্তিত্বশীল হয়েছে এমনও কথাও বলা যায় না। আত্মা অজ বা জন্মরহিত, নিত্য, শ্বাশ্বত ও পুরাণো অর্থাৎ অনাদি। শরীরের বিনাশ হলেও এর বিনাশ হয় না।

গীতাতে আরো বলা হয়েছে—

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।

অর্থাৎ আত্মাকে শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করা যায় না, অগ্নি একে দহন করতে পারে না, জল একে আদ্র বা সিক্ত করতে পারে না এবং বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না। আত্মার অমরত্বের কথা বোঝাতে গিয়ে গীতায় বলা হয়েছে—

"অচ্ছেদ্যোহয় মদাহ্যোহয়ম ক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুর চলোহয়ং সনাতনঃ।"

অর্থাৎ এই আত্মাকে কোনভাবে ছেদন বা খণ্ড করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, পোষণ বা শুষ্ক করা যায় না। এই আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থানু, স্থির স্বভাব সম্পন্ন ও অনাদি।

আত্মা সম্পর্কিত গীতার পূর্বোক্ত উক্তিগুলোর সঙ্গে বিবেকানন্দ সহমত হয়ে তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি থেকে বলেন যে, মানুষের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে এই বর্ণনা আত্মার অন্তত দুটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে—**প্রথমতঃ**, মানুষের ক্ষেত্রে আত্মার এই বৈশিষ্ট্য ঐশ্বরিক প্রকৃতি সদৃশ। **দ্বিতীয়তঃ**, ব্যক্তি মানুষের ভাষা দিয়ে আত্মার এই দিকটিকে সঠিক ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বেদান্তী। তাই তিনি আত্মার যথার্থ স্বরূপকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেন। আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা দেখানোর জন্য বেদান্তে যে সব যুক্তি দেখানো হয়েছে বিবেকানন্দের দেওয়া যুক্তি তার মতোই। যে বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্য তা হল, আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা না দেখাতে পারলে পরমসত্তার (Absolute Reality) একত্ব (monistic) চরিত্রটি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। একত্বের অংশ বা অঙ্গ হিসেবে আত্মাকে গণ্য করা যায় না, কেননা সেক্ষেত্রে সেই 'এক' যৌগিক (composite) হয়ে পড়বে যার নিজেরই অংশ বা দিক রয়েছে। আত্মাকে পরমসত্তার প্রকাশ হিসেবেও ভাবা যাবে না, কেননা সেক্ষেত্রে আত্মা ব্রহ্মের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র সত্তা হয়ে পড়বে। সুতরাং তাদের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার একমাত্র উপায় হল একথা বলা যে, এই দুটি মূলত এক বা অভিন্ন এবং তাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা প্রাতিভাসিক বা বাহ্য মাত্র।

আত্মার প্রকৃত স্বরূপ (real nature) এবং আত্মার প্রতিভাত রূপের মধ্যে (apparent nature) প্রভেদকে নানাভাবে তুলে ধরার চেষ্টায় বিবেকানন্দ স্পষ্টতই যেদিকে জোর দিয়েছেন তা হল আপাত ভিন্নতা কোনভাবেই মানুষের যথার্থ রূপের হানি করে না বা তাকে প্রভাবিত করে না। আত্মা এক সর্বব্যাপী সত্তা (অস্তিত্ব) এবং তা বহুরূপে বা বিচিত্রভাবে প্রতিভাত হয়। এই ধারণাটিকে বোঝাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন উপমা প্রয়োগ করেছিলেন। যথা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমরা যখন ঢেউ দেখি তখন বিভিন্ন ঢেউ বিভিন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু আলাদা বলে মনে হলেও বাস্তবে তারা সমুদ্র থেকে ভিন্ন নয়। বেদান্তে যে উপমাটি প্রচলিত তা হল 'প্রতিবিম্ব'। বিবেকানন্দ এই উপমাটি গ্রহণ করে বলেন, একই সূর্য বিভিন্ন পাত্রের জলে প্রতিবিম্বিত হলে সেই কিরণগুলি ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। কিন্তু এই সব বিভিন্ন প্রতিবিম্ব কেবল সূর্যের আপাত প্রতিবিম্ব; প্রকৃত সূর্য কিন্তু একই থাকে। তিনি তাঁর 'জ্ঞানযোগ' এর এক জায়গায় লিখেছেন—'...সুতরাং তাহলে কেবল একটিই আত্মা, এক নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিবর্তনীয়, এর পরিবর্তন হয়নি, এর কখনো পরিবর্তন হবে না এবং এইসব বিভিন্ন পরিবর্তন সেই একই আত্মার প্রতিভাস...'। বাস্তবিকপক্ষে বিবেকানন্দ নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে এই অভিন্নতা বা তাদাত্ম্য সম্পর্কে আমাদের সাধারণত কোন সচেতনতা থাকে না। কিন্তু কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এর দিকে নির্দেশ করে। এই ধরনের অভিজ্ঞতার খুব স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত হল সেই অনুভূতি যা একজন মানুষ তার প্রতিকূলতা ও সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তা দূর করার অবিরাম প্রয়াসের ক্ষেত্রে লাভ করে থাকে। বাস্তবিকই মানুষ যে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে, তা মানুষের ঐশ্বরিক প্রকৃতির সব থেকে বড় প্রমাণ। এই ঘটনার আর একটি প্রমাণ হল মানুষের মধ্যে নিজেকে অতিক্রম

করে যাবার এক অন্তর্নিহিত সামর্থ্য রয়েছে। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় যে মানুষের পারিপার্শ্বিক ও তার বাইরে এমন কোন সীমানা দেওয়া যাবে না যার কোনও উচ্চতর সীমানা (upper limit) আছে। এমন কিছু নেই যা সে অতিক্রম করতে পারে না। সত্যের অনুসন্ধানে তার কোন সীমা সে মানে না। সে চায় জ্ঞান অর্জন করতে। মঙ্গলজনক ও মহৎ কিছু করে তার ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করার জন্যই সে আসে। আরো এগিয়ে সে আত্ম-অতিক্রমণ (self transcendence) করতে চায়, আর এই সামর্থ্যই আত্মা ও ব্রহ্মের একত্বের বা তাদাত্ম্যের প্রমাণ।

তবু আমরা এই অভিন্নতা বা তাদাত্ম্যের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি না। বিবেকানন্দ স্বীকার করেন, যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমরা বাস করি, সেখানে আমাদের চেতনাকে তার সুদূরতম সম্ভাব্য সীমায় বিস্তৃত করা সম্ভব হয় না। মানুষের এই দিকটি সম্পূর্ণ বোঝার জন্য যে মানসিক সামর্থ্য, চেতনা, দেহধারী অস্তিত্ব প্রভৃতি রয়েছে তা সবই অপর্যাপ্ত ও অসমর্থ্য। অথচ ওই অভিন্নতা বা একত্ব বোঝার জন্য এদের প্রয়োজন রয়েছে। বিবেকানন্দ মনে করেন, আমরা কেবল আমাদের অতি-মানবিক সামর্থ্যের খণ্ড চিত্রই পেয়ে থাকি। আমাদের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রয়াসগুলোর সাহায্যেই মানুষের স্বরূপের এই আবশ্যিক দিকটি বোঝা সম্ভব হয়। আত্মা যদি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয় তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন উঠতে পারে তাহল—আত্মার বহুত্বের অভিজ্ঞতা আমাদের হয় কেন? এই অভিন্নতা বা তাদাত্ম্য একটি ঘটনা হলে একত্ববাদে (monism) বহু আত্মার কোন স্থান নেই। এই সমস্যার সঙ্গে আরো বেশ কিছু সমস্যা জড়িয়ে আছে। যেমন আত্মার বহুত্বের সমস্যা, দেহ মনের সমস্যা ইত্যাদি।

এই বিষয়ে বেদান্তীদের নিজস্ব উত্তর আছে। বিবেকানন্দও একজন বেদান্তী হিসেবে বৈদান্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে। তার সমাধানে বেদান্তের মূল সুরটুকু থাকলেও তিনি এমন কিছু বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন যেখানে সাধারণত বেদান্তীরা গুরুত্ব আরোপ করেন না। বিবেকানন্দ বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন যে, আত্মার আপাত বহুত্ব ও জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নগুলি সবই বিভ্রান্তিকর। আত্মা এক—সে আসেও না, যায়ও না, জন্মায়ও না এবং মৃত্যুও হয় না। কাজেই তার পুনর্জন্মের কোন অবকাশই নেই। একজন খাঁটি বেদান্তীর মতো বিবেকানন্দও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে বাস্তবিকপক্ষে আত্মা আমাদের বিভ্রান্ত বা প্রতারিত করে না। উপলব্ধির অবস্থায় সচেতন হতে হয় যে, আত্মার বহুত্ব এক ভ্রান্তি এবং এই ভ্রান্তি অর্থাৎ এক আত্মাকে বহু বলে মনে করাও আত্মার একধরনের ক্রীড়া।

উপরে বিবেকানন্দ প্রদত্ত আত্মার যে বর্ণনাদেওয়া হয়েছে তা বেদান্তের দেওয়া বর্ণনার সদৃশ বলা যায়। কিন্তু যে বিষয়টিতে বেদান্তের সঙ্গে তাঁর বর্ণনার অমিল রয়েছে তাহল, তিনি মানুষের সসীমতার দিকগুলোকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে মনে করেন না। অজ্ঞানতাবশত মানুষ যতক্ষণ দেহধারী অবস্থার সত্তাতে আত্মার বহুত্বতে বিশ্বাস করে, ততক্ষণ এর বাস্তবতা তাকে মেনে নিতে হবে। কাজেই এই দিকটির সম্পূর্ণ বিনাশ বা অবলুপ্তিতে নয়, বরং তার জাগরণ ও পূর্ণতার মধ্যে তার উত্তরণ (upliftment)। একজন নিরাসক্ত ব্যক্তি, যিনি তার

জাগতিক প্রয়োজনকে ও দাবীকে পরিত্যাগ করতে পারেন ও স্বাধীনভাবেই তাদের অবদমিত করেন তিনি এক মহান ব্যক্তি। তবে তাকেও আমরা মহৎ বলব যিনি তার দৈহিক দিকগুলিকে পূর্ণতর করে তুলতে সক্ষম হন।

মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনায় আরো কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন আছে। প্রথমেই আমরা বলতে পারি, মানুষের যথার্থ স্বরূপ হল তার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা তার আত্মার সারধর্ম বা সারসত্তা; কোন গুণ বা ধর্ম নয়, বরং যা আত্মাতে থাকে। আত্মা স্বরূপত স্বাধীন। কেননা আত্মা স্বরূপত স্বাধীন না হলে তার কোন বন্ধন (bondage) থাকতে পারে না। অর্থাৎ তার কোন বদ্ধাবস্থা হতে পারে না। আত্মার এই বদ্ধাবস্থা আসলে আপাত বা প্রতিভাসমাত্র। আলোচ্য এই দুটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং বাস্তবিকপক্ষে উঠেওছিল। কিন্তু প্রত্যেকটির উত্তরই আমরা বিবেকানন্দের কাছ থেকে পেয়েছি। তবে এর আলোচনা এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ধর্মের স্বরূপ

(Nature of Religion)

'ধর্ম' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যা ধারণ করে রাখে। কিন্তু প্রশ্ন হল কাকে ধারণ করে রাখে? উত্তরে বলা যায় ব্যক্তিকে ও সমাজকে। এই কথাটিই অন্যভাবে বলা যায় ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে। তাই ধর্মের রয়েছে একটি **ব্যক্তিগত দিক** ও একটি **সামাজিক দিক**। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তবে মানব জীবনে ধর্মের প্রয়োজন জাগতিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য নয় বা জৈবিক প্রবৃত্তি পূরণের জন্য নয়। ধর্ম জীবনের এক অনিবার্য বা আবশ্যিক দিক। বিবেকানন্দ তাঁর 'জ্ঞানযোগ'-এ লিখেছেন—'মানব জাতির অদৃষ্ট বা ভাগ্য গড়ে দিতে যে সব শক্তি কাজ করেছে এবং এখনও করছে, তাদের মধ্যে বেশ কিছুই সুপ্ত (potent) রয়েছে, যার প্রকাশকে আমরা ধর্ম বলি।' সাধারণভাবে কেবল সেই সব জিনিসকেই আমরা প্রয়োজনীয় বলি যা জীবনের দৈনন্দিন ও বাহ্যিক অভাবকে দূর করে থাকে। ভৌতিক ও জাগতিক প্রয়োজনীয় বিষয় হল খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, আশ্রয় ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোই কেবল জীবনের প্রয়োজনীয় বা আবশ্যিক বিষয় নয়। বরং বিষয়টি প্রমাণ করে যে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাসস্থানের মাঝখানে থেকেও মানুষ আরো উচ্চতর ও উন্নততর বিষয়ের আকাঙ্খী বা পিয়াসী। এই আকাঙ্খা (Craving) হল তার ধর্মীয় আকাঙ্খা, এর চরিতার্থতার অন্বেষণ ছাড়া সে বাঁচতেই পারে না।

বিবেকানন্দ মনে করেন, ধর্ম কেন মানুষের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক তা বিভিন্ন ভাবে দেখানো যায়। যেমন মানুষের মধ্যে উচ্চতর ও বৃহত্তর কোন কিছুর আকাঙ্খা রয়েছে যা তার চারপাশের বাহ্যিক জগৎ চরিতার্থ করতে পারে না। এর থেকেই বোঝা যায় যে ধর্ম তার জীবনের আবশ্যিক বা অনিবার্য দিক। তাছাড়া ধর্মের মধ্যেই এক ধরনের অনিবার্যতা বা

অবশ্যম্ভাবীতার ব্যাপার রয়েছে। তাই ধর্মকে আমরা বাদ দিয়ে চলতে পারি না কেননা ধর্মকে ত্যাগ করাও এক ধরনের ধর্মে পরিণত হওয়া। তাই সেটিই তার অনিবার্যতা বা প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দেয়। সর্বোপরি যুগ যুগ ধরে ধর্মের টিকে থাকার ঐতিহাসিক ঘটনাই তার অনিবার্য চরিত্রের প্রমাণ। দেখা গেছে জগতে নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান কিছু সময়ের জন্য অস্তিত্বশীল থেকে তারপর কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, কিন্তু ধর্ম সব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে; এমন কি বিপরীত ও বিপদ-শঙ্কুল পরিস্থিতিতেও তার চিরন্তন অস্তিত্বের ঘোষণা করছে। আজও তা বিলীন ও বিনষ্ট হয়ে যায়নি। ইতিহাসে দেখা গেছে যখনই ধর্মকে অবদমিত করার চেষ্টা হয়েছে, তখনই সেটি আবার নতুন রূপে নতুন আঙ্গিকে আবির্ভূত হয়েছে। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে ধর্মকে বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না, কেন না এটি মানব জীবনের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।

ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি সংজ্ঞার মধ্যেই ধর্মের কোন না কোন দিকের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানব মনের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা নামক তিনটি উপাদানের প্রভাব ধর্মের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বিবেকানন্দও এই ব্যাপারটি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন যে ধর্মের কোন বর্ণনাই একেবারে সঠিক ও পর্যাপ্ত বলা যায় না, প্রতিটি সংজ্ঞার মধ্যেই এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা অন্য সংজ্ঞার মধ্যে নেই। তাই, সব থেকে শ্রেষ্ঠ উপায় হল সংজ্ঞা দেওয়ার পথে না গিয়ে সেই দিকগুলোতে আলোকপাত করা যেগুলো অনুপস্থিত থাকলে ধর্মীয় ক্রিয়াকে ধর্মীয় বলেই অভিহিত করা যায় না।

ধর্মের দুটি দিকের, অর্থাৎ আন্তর (internal) ও বাহ্য (external) দিকের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। এর বাহ্য দিকটিকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত বলা যায় না, বরং একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে এর অবশ্যই মূল্য আছে। কিন্তু এই বাহ্যিক দিকটি ধর্মীয় বলে বিবেচিত হতে পারে যদি তা আন্তর দিকের অনুমোদন লাভ করে। কাজেই ধর্মের সারটুকু ততখানি বাহ্য দিকটিতে নিহিত নেই, যতখানি তার আন্তর দিকটিতে নিহিত আছে। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেন যে ধর্মের অবান্তর দিকের বিকাশ সম্ভবপর কারণ মানুষের গঠনের মধ্যেই তার অনিবার্য অস্তিত্ব। ধর্মের স্বরূপ সঠিক ভাবে বোঝা যেতে পারে যদি তার ধর্মীয় অর্থটিকে বিশ্লেষণ করা যায়।

বিবেকানন্দ একজন মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ধর্মের এক সার্বজনীন চরিত্র রয়েছে যেহেতু তার উপস্থিতি সর্বত্র; এমন কি নিরীশ্বরবাদীরও একধরনের ধর্ম আছে। তাছাড়া মানব মনের যে তিনটি উপাদানের কথা আগে বলা হয়েছে, সেই সব কটি উপাদানই ধর্মের মধ্যে উপস্থিত থাকে—অর্থাৎ ধর্মের রয়েছে জ্ঞানমূলক উপাদান, অনুভূতিমূলক উপাদান ও ইচ্ছামূলক উপাদান। একথা ঠিক যে এই তিনটি উপাদান ধর্মের মধ্যে সমানভাবে বা সমপরিমাণে থাকে না, তবে ধর্মের স্বরূপ নির্ধারিত হয় সব থেকে প্রভাবশালী উপাদানটির দ্বারা। অনুভূতিমূলক দিকটির প্রভাব বেশি

থাকলে ধর্ম হয়ে পড়ে আবেগীয় বা মরমী (mystical); আবার জ্ঞানীয় উপাদানটির বেশি প্রভাবে ধর্ম হয়ে পড়ে বৌদ্ধিক; ইচ্ছামূলক উপাদানের প্রভাবে ধর্ম হয় ব্যবহারিক ও আচরণ সর্বস্ব (ritualistic)। কিন্তু সত্যিকারের ধর্মীয় চেতনা এইসব দিকগুলোকে সুসংহত করে তার একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ তুলে ধরে।

বিবেকানন্দ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে বলেন এবং তা হল ধর্মের মধ্যে এক অতিপ্রাকৃত উপাদান অনিবার্যভাবে মিশে রয়েছে। এই উপাদানটি ধর্মের মধ্যে শুধু এক অনন্য বৈশিষ্ট্যই প্রদান করেনি, অন্যান্য বৌদ্ধিক শাস্ত্র থেকে একে পৃথকও করেছে। এই অতি প্রাকৃত উপাদানটির স্বরূপ অনেক কিছুই হতে পারে—যেমন এক ব্যক্তিক ঈশ্বর (personal god), পরমসত্তা (absolute), বা এক অতিপ্রাকৃত নিয়ম (supernatural law) বা এই ধরনের কিছু। ধর্মের প্রত্যাশীর ঐকান্তিক কাম্য বিষয় হল এই উপাদানটি, তাই একে ধর্মের মর্মবস্তু বলা যায়।

বিবেকানন্দ আরো মনে করেন ধর্ম শুধু ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার চেষ্টাই নয়, আমাদের যুক্তিবোধ, বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক বিচার-বিবেচনাকে অতিক্রম করাও তার লক্ষ্য। এইজন্য একে অনুভব-অতিক্রমী (trans-empirical) ও বুদ্ধি-অতিক্রমী (trans-rational) বলা হয়ে থাকে। লক্ষ্যণীয় ধর্মীয় ঘটনাবলী মূর্ত কোন কিছু নয় বরং তা কোন-না-কোন ভাবে এক ধরনের বিমূর্তকরণ। কোন সর্বব্যাপী সত্তা, ঈশ্বররূপী বিমূর্ত ব্যক্তিত্ব, নৈতিক নিয়ম ইত্যাদি নামে সব ধর্মের মধ্যেই এই বিমূর্তকরণ প্রকাশিত হয়। বিবেকানন্দ স্বীকার করেন যে সব ধর্মেই বিমূর্তকরণের এক আদর্শ লক্ষ্য করা যায় যা আমাদের সামনে কোন ব্যক্তি হিসেবে, বা কোন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হিসেবে অথবা একটি নিয়ম হিসেবে বা একটি উপস্থিতি হিসেবে বা এর সারসত্তা হিসেবে প্রদত্ত হয়।

বিবেকানন্দ ধর্মের ক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্যকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, তাহল তার সামাজিক বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ কেবল ব্যক্তির কাছেই ধর্মের মূল্য ও তাৎপর্য আছে তা নয় এর একটি সামাজিক উপাদানও রয়েছে। নৈতিকতা ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে সাধারণত বলা হয় যে নৈতিকতা সামাজিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করলেও ধর্মের মূল্য সামাজিক ব্যাপারটিকে অতিক্রম করে যায়। বিবেকানন্দ মনে করেন, ধর্ম নৈতিকতার ভিত্তি প্রদান করে। একটি কাজকে যখন ভালো বলা হয় এবং ভালো কাজ করা ঠিক—এই জাতীয় কথাবার্তায় এটিই বোঝা যায় যে এর পিছনে নিশ্চয় কোন আদর্শ আছে, ও সেই আদর্শ অবশ্যই সর্বজনীন (universal)। ধর্ম এই সর্বজনীন আদর্শ প্রদান করে এবং যার ফলে নীতিশাস্ত্রকে সমর্থন করা যায়।

বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন যে ধর্ম মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বোধ জাগ্রত করে, অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের উপলব্ধি ঘটিয়ে থাকে। তবে 'আধ্যাত্মিকতা' বলতে বুঝতে হবে সেই সব কিছু যা ইন্দ্রিয়গত ও বৌদ্ধিক বিষয়কে অতিক্রম করে যায়। ধর্মকে যখন আধ্যাত্মিক অন্বেষণ বলে ঘোষণা করা হয় তখন আসলে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে সচেতনতাকেই বোঝানো হয়। ধর্মের মধ্যে যে অতিপ্রাকৃত (super-natural) উপাদান রয়েছে

তার স্বরূপ সম্পর্কে বিবেকানন্দ কোন সুস্পষ্ট উত্তর দেননি। এটি যে-কোন কিছু যেমন—কোন ঈশ্বর বা এক নৈর্ব্যক্তিক নীতি বা পরমসত্তা বা কোন নিয়মকেই বোঝাতে পারে। বিবেকানন্দ ধর্মের মূল্য নানা ভাবে নির্ধারণ করেছেন। ধর্মকে মানব মনের সব থেকে মহত্তর ও স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম বলে গণ্য করা যায়। এটি মানব মনে পরিতৃপ্তি, শান্তি ও আনন্দ আনে। মানব মনের সর্বোত্তম চালিকা শক্তি হল ধর্ম। মানব মনকে উদ্দীপ্ত করার আর কোন আদর্শ বা কোন উল্লেখযোগ্য পন্থা নেই।

ধর্মের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ যে তোলা হয় তার কারণ যথার্থ ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কিত অজ্ঞতা। এই জন্যই যথার্থ ধর্ম ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের (institutional religion) মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। বিবেকানন্দ মনে করেন যথার্থ ধর্ম হবে সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন (universal)। সেটি যাবতীয় বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী, বিঘ্নসৃষ্টিকারী প্রবণতার ঊর্দ্ধে থাকবে। তিনি তাঁর 'জ্ঞানযোগ' এর এক জায়গায় বলছেন—'যখন আমরা যথার্থ আধ্যাত্মিক, সার্বিক প্রত্যয়ে পৌছাই তখন এবং তখনই কেবল ধর্ম যথার্থ ও জীবন্ত হয়ে পড়ে। এটি আমাদের স্বরূপের মধ্যেই চলে আসে, আমাদের প্রতিটি গতিবিধির মধ্যেই বেঁচে থাকে, আমাদের সমাজের প্রতিটি ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এটি আগের থেকেও অসীমভাবে মঙ্গল বা কল্যাণের শক্তি বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সংঘাত বা বিরোধ তা আসলে তাদের উপাদানের মধ্যে ভিন্নতার জন্যই।

ধর্মের তিনটি দিক বা উপাদান হল দর্শন, পুরাণ, অনুষ্ঠানবিধি (ritual)। প্রত্যেকটি ধর্মের এই তিনটি উপাদান থাকলেও তাদের নিজস্বতা রয়েছে। ফলে একটি ধর্মের দর্শন, পুরাণ ও আনুষ্ঠানিক বিধির সঙ্গে অন্য আর একটি ধর্মের দর্শন পুরাণ ও প্রথানিষ্ঠ আচরণবিধি মেলে না। একটি সর্বজনীন ধর্মকে কিন্তু এই সব ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে উঠতে হবে এবং এই তিনটি উপাদানের মধ্যেও সর্বজনীনতার সন্ধান করতে হবে। যদিও এই কাজটিকে স্বামী বিবেকানন্দ কঠিন বলেই মনে করতেন।

'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র প্রথম খণ্ডে (পৃঃ-৩২৬) আমরা ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সহজ সরল ব্যাখ্যা লক্ষ্য করি। সেখানে তিনি বলছেন—'ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পিণ্ড, যাহাকে আমরা জগৎ বলি এবং ইহার অতীত অনন্ত সত্তা—এই দুটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে।' বিবেকানন্দ মনে করতেন প্রকৃত ধর্ম বা যথার্থ ধর্ম যাকে 'সর্বজনীন ধর্ম' (universal religion) বলা হয় সেই ধর্মে এই দুটি বিষয়ই থাকা দরকার। এই কর্মাশ্রয়ী ধর্মের আদর্শ সর্বজনীন এবং সেটি সব দেশে ও সব ধরনের অধিকারীরই উপযোগী।

প্রতিটি ধর্মেরই একটি কেন্দ্রীয় বিষয় থাকে—যা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। আমাদের সনাতন ভারতীয় ধর্মে তিনি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন। তাই অনেকে বলে যে, ঈশ্বরের অনুসন্ধান বা অন্বেষণই হল ধর্মের মূল লক্ষ্য। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন, যেহেতু সব জীবের মধ্যেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বিরাজমান, তাই জীবের সেবাতেই ঈশ্বরের

সেবা। আর নিজের আন্তরসত্ত্বার উপলব্ধিই তার ধর্ম। তাঁর এক বিখ্যাত উক্তি হল—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।"

প্রকৃতপক্ষে মানুষের সেবা, আরও স্পষ্টভাবে বললে, জীবের সেবাকেই স্বামীজী শিব বা ঈশ্বরের সেবা বলে গণ্য করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, যেহেতু আমাদের অন্তরে পরমাত্মারূপী ব্রহ্ম বিরাজমান, তাকে উপলব্ধি করতে হলে সেবার অর্থাৎ জীব সেবার মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। প্রসঙ্গত মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন— "Service to Man is service to God". যার অর্থ মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন, কেবল মানুষ নয়, সব জীবের সেবাই ঈশ্বর সেবা। তাঁর মতে ধর্মের আদর্শ হওয়া উচিত সেবা, মঙ্গল, করুণা, দয়া প্রভৃতি। এইরকম ভাবনা থেকেই তিনি সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ প্রদান করেছিলেন।

বিশ্বজনীন বা সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ
(The Ideal of Universal Religion)

বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ জানার আগে আমাদের জানতে হবে বিশ্বজনীন ধর্ম (universal religion) কাকে বলে। এক কথায় এর কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না হলেও বলা যায়, যে ধর্ম পৃথিবীর সব ধর্মকেই সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়, সমান দৃষ্টিতে দেখে, সব মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বোধে এক করে দেখে তাকেই বিশ্বজনীন ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায়। ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন, বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণবিধি ও বিশ্বাস থাকলেও তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও মিলনের অভাবে মাঝে মাঝেই সংঘাত ও সংঘর্ষ ঘটে। তাছাড়া দুটি ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষও লক্ষ্য করা গেছে। ধর্মকে ঘিরেই মানুষে মানুষে শত্রুতা জন্ম নিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অনেক নজির রয়েছে। কিন্তু শান্ত চিত্তে ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এইসব ঘটনার পেছনে রয়েছে নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ সম্বন্ধে এক ধরনের অহংবোধ। আরো যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হল দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সত্ত্বেও সব প্রধান ধর্মগুলোই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। উল্লেখযোগ্য যে আন্তর ও বাহ্য এই উভয় ধরনের সংঘাতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় দুর্বল না হয়ে বরং ভালোভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। দার্শনিক, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ও আচারনিষ্ঠ—ধর্মের এই তিনটি স্তরের মধ্যে বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব দেখা যায় যা মাঝে মাঝে তীব্র বিরোধিতার আকার ধারণ করে। সব থেকে বড় ক্ষতি করে উগ্রপন্থীরা কারণ উগ্রতা কখনও কখনও উন্মত্ততার জন্ম দেয়। এইসব বিচ্ছিন্নকারী বিষয়গুলো স্বীকার করলে এক সর্বজনীন ধর্মের ধারণা কি বাস্তবসম্মত না নিছক আদর্শগত?

কিন্তু এইসব ভিন্নতার পিছনে আমাদের অবশ্যই এক গভীর সাধারণত্ব স্বীকার করতে হবে যা নির্দেশ করে যে সর্বজনীন ধর্ম আগে থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল ও তা প্রতিনিয়ত

বিবর্তিত হচ্ছে ও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করছে। কোন দুজন ব্যক্তি একেবারে একরকম হতে পারে না, তবু এইসব ভিন্নতা সত্ত্বেও মানবত্বের একটি সাধারণ সূত্র রয়েছে। ঠিক সেই রকমই হল সর্বজনীন ধর্ম যা পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যে দিয়ে চলমান ঈশ্বরের রূপে ও চিরন্তন ভাবে অস্তিত্বশীল থাকবে। বিবেকানন্দ বলেন— "যদি আমি কোন কিছু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হই তাহল এই মানবত্ব যা সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে। ঠিক তেমনি হল সর্বজনীন ধর্ম যা পৃথিবীর সমস্ত বিচিত্র ধর্মের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের রূপে এগিয়ে চলেছে। এটি অবশ্যই অস্তিত্বশীল রয়েছে ও চিরন্তনভাবে থাকবে। 'গীতা'তে দেখা যায় ভগবান নিজেকে সুতো (thread) বলে গণ্য করেছেন যা সব মুক্তকে (pearl) একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে এবং প্রতিটি মুক্ত হল এক একটি ধর্ম বা এক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এই বিষয়টি মানবজাতীর অধিকাংশেরই অজ্ঞাত।" এইসব ভিন্নতার মোকাবিলা করা হবে কিভাবে? এক্ষেত্রে একমাত্র বুদ্ধিসম্মত উপায় হল সেগুলোকে অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া। বিবেকানন্দ আরও বলেন—"আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে যে শত সহস্র উপায়ে বা পন্থায় সত্য প্রকাশিত হতে পারে এবং প্রতিটি পন্থাই যতখানি এগিয়েছে ততখানি সত্য হয়েছে সমকালীন ভারতীয় চিন্তাধারা আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে যে একই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা গেলেও একই বিষয় থাকবে...।" বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে প্রতিটি ধর্মের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে আপাত স্ববিরোধিতা ও জটিলতা লক্ষ্য করা গেছে। সব ধর্মেরই লক্ষ্য হল আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি। সেটিই এক সর্বজনীন ধর্ম। বিবেকানন্দ বলেন— ধর্ম কতকগুলো মতবাদ ও অন্ধবিশ্বাসেই নিহিত থাকে না। কোন্ অন্ধবিশ্বাসে একজন বিশ্বাসী সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল সে কি উপলব্ধি করেছে। সৌভাগ্যবানের আত্মা বিশুদ্ধ, কারণ তিনি এই জীবনেই ঈশ্বরকে দেখতে পাবেন। এই ঈশ্বরপ্রাপ্তিই হল মুক্তি। এই মুক্তি লাভের সামর্থ্য আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমরা ঈশ্বরের মধ্যেই বাস করি এবং তাঁর মধ্যেই ঘোরাফেরা করি। গ্রন্থ কখনও ধর্ম তৈরি করে না, বরং ধর্মের দ্বারাই গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, সব ধর্মের লক্ষ্যই হল আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। এই হল সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন ধর্ম। বিবেকানন্দ বলেন—সব ধর্মের মধ্যে যদি একটি মাত্র সত্য থাকে, তাহল ঈশ্বরের উপলব্ধি। আদর্শগত ও পদ্ধতিগত দিক থেকে অমিল থাকলেও সেটিই হল কেন্দ্রীয় বিষয়।

বিবেকানন্দ বলতেন ধর্মকে এখনই উপলব্ধি করতে হবে। ধার্মিক হওয়া বলতে আমাদের বুঝতে হবে কোন ধর্ম দিয়ে শুরু না করা। প্রথম নীতিটি হল যে উপলব্ধিই ধর্ম এবং যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই ধার্মিক। তিনি এক জায়গায় বলছেন—আমার মনে এখন যে আদর্শ উপস্থাপিত হয়েছে তা হয়ত কেবল একটি স্বপ্নও হতে পারে। কারণ আমি জানি না যে এই পৃথিবীতে তার উপলব্ধি হবে কি না। কিন্তু মাঝে মাঝে রূঢ় বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে মৃত্যুর চাইতে কোন স্বপ্ন দেখা অনেক ভাল। অপ্রিয় ঘটনাবলীর চাইতে স্বপ্নে দৃশ্যত মহৎ সত্য অনেক বেশী ভাল। কাজেই এইরকম স্বপ্ন আমাদের দেখতে হবে।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, ধর্মের যে নানা রূপ বা প্রকার রয়েছে, সেগুলো কি

একসঙ্গে সত্য হতে পারে? বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে বিরোধীতা তা একই সময়ে ও একই সঙ্গে কিভাবে সত্য হতে পারে? এখানেই সর্বজনীন ধর্মের বিষয়টি এসে পড়ে। একটি সর্বজনীন ধর্ম বাস্তবিকই সর্বজনীন হতে পারে যদি তা অন্ততঃ দুটি শর্ত পূরণ করে—ধর্মকে ব্যক্তির কাছে উন্মুক্ত করে দিতে হবে, স্বীকার করে নিতে হবে যে কোন ব্যক্তিই 'এই ধর্ম' 'ওই ধর্ম' ইত্যাদি ধর্ম নিয়ে জন্মায় নি। সে কোন্ ধর্মকে গ্রহণ করবে তা পরিণামে তার অন্তরের পছন্দ ও নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় করেই তাকে বিশ্বজনীনত্বে উত্তীর্ণ করা যায়। প্রকৃত সর্বজনীন ধর্ম প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সন্তোষ ও তৃপ্তি দিতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাকে বিশ্বজনীন ধর্ম অতিক্রম করে যাবে। তাই তা সকলের কাছেই আনন্দদায়ক ও যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হবে। যদি সত্যিকারের এক সর্বজনীন ধর্ম থাকে, তাহলে তাকে উদার ও উন্মুক্ত হতে হবে যাতে সব বিবাদ ও বিরোধের মীমাংসা হতে পারে।

এইরকম বিশ্বজনীন বা সর্বজনীন ধর্মের অস্তিত্বে কেউ কেউ সংশয় বা সন্দেহ পোষণ করলেও বিবেকানন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে এইরকম ধর্ম আগে থেকেই রয়েছে। আমরা বাহ্যিক বিবাদ-বিসংবাদগুলোর মধ্যে এতই নিজেদের জড়িয়ে ফেলি যে তার উপস্থিতির ব্যাপারটি আমাদের নজরে আসে না। বিবেকানন্দ বলেন যে সর্বজনীন ধর্মের অস্তিত্বের ধারণাটি খুবই সহজবোধ্য। কেননা বিভিন্ন ধর্মের দিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখলে ধরা পড়বে যে তাদের মধ্যে যে বিরোধীতা তা প্রকৃত বিরোধীতা নয়, বরং প্রতিটি ধর্মই একে অন্যের পরিপূরক। ধর্মের সত্যতা এতই ব্যাপক যে বিভিন্ন ধর্ম কেবল একটি বা দুটি দিকে গুরুত্ব দিয়ে সেই বিষয়ে এতই মগ্ন হয়ে থাকে যে অন্যান্য দিকগুলোর দিকে হয় নজর দেয় না, নয় তো উপেক্ষা করে। এইভাবে প্রতিটি ধর্ম ধর্মের প্রগতিতে উপাদান ও বৈচিত্র বাড়িয়ে থাকে। তাদের নিজ নিজ দিক থাকে তাদের ব্যাখ্যা আংশিক ও অসম্পূর্ণ হলেও বিবেকানন্দের মতে এদের অবদানকে ভুললে চলবে না। কেননা আমরা সত্য থেকে সত্যে, ক্ষুদ্রতর সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যের দিকে এগিয়ে যাই, কখনোই ভ্রান্তি থেকে সত্যের দিকে এগিয়ে যাই না।

বিবেকানন্দ বলেন একই বস্তুর বিভিন্ন স্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে। বিভিন্ন কোণ থেকে একই বস্তুর যদি ছবি তোলা হয় তাহলে দেখা যাবে কোন দুটি ছবি একই রকম হচ্ছে না; এমনকি তারা ভিন্ন ধারণাও দিতে পারে। অথচ সেগুলো তো একই বস্তুর ছবি। ঠিক তেমনি সত্যকে আমাদের নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখি, নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে রঞ্জিত করি, আমাদের নিজেদের বিচার ও বোধের অভিনব পন্থা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। এর জন্যই মানুষে মানুষে এতো ভিন্নতা। এর থেকেই বিভিন্ন মতের মধ্যে প্রভেদের জন্ম হয় এবং এর থেকেই বিভিন্ন মতের স্ববিরোধী চরিত্রটিও ধরা পড়ে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা একই বাস্তব সত্তার বিভিন্ন দিক এবং তাই তারা একে অন্যের পরিপূরক ও সংযোজক (supplementary)।

আমরা আগেই বলেছি, বিবেকানন্দের মতে প্রতিটি ধর্মের মধ্যে তিনটি অংশ আছে।

প্রথমতঃ রয়েছে দর্শন, যা ওই ধর্মের পরিসরকে উপস্থাপিত করে, যেমন তার মূলনীতিগুলো, তার লক্ষ্য বা গন্তব্য এবং কোন্ পন্থায় সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। দ্বিতীয় অংশটি হল তার পুরাতত্ত্ব যা দর্শনকে মূর্ত করে। এর মধ্যে রয়েছে কিংবদন্তী কাহিনী যা মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বা অতিপ্রাকৃত সত্তার বিমূর্ততাকে কিছুটা কাল্পনিক মানুষের এবং অতিপ্রাকৃত সত্তার জীবনে মূর্ত করার প্রচেষ্টা। তৃতীয়টি হল প্রথানিষ্ঠ আচরণ রীতি। এটি এখনও মূর্ত এবং বিভিন্ন রূপ, উৎসব, বিভিন্ন দৈহিক প্রবণতা, ফুল, ধূপ-ধূনা এবং অন্যান্য কিছু দিয়ে পালন করা হয় যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদন জানায়। প্রতিটি স্বীকৃত ধর্মেরই এই তিনটি দিক বা অংশ রয়েছে তবে কোনটি কোনও একটি বিশেষ উপাদানে কোনটি আবার অন্য উপাদানের উপর গুরুত্ব দেয়।

তাহলে কিভাবে ধর্মের একটি সর্বজনীন রূপ পাওয়া সম্ভব? বিবেকানন্দ বলেন, এইরকম একটি ধর্ম আগে থেকেই রয়েছে। সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের (universal brotherhood) কথা আমরা শুনেছি এবং সমাজ এর উপদেশ ও প্রচারে কতখানি আগ্রহী তাও আমরা জানি। ইসলামধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্মে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়। বিবেকানন্দ বলেন—এখনও পর্যন্ত বাস্তবিক পক্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে কোন সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে তারা যে অস্তিত্বশীল তা আমাদের জানা। আমরা সবাই মানুষ হলেও আমরা কি সবাই সমান? নিশ্চয়ই নয়। কেবল উন্মাদরাই বলবে আমরা সবাই সমান, আমরা দৈহিক শক্তিতে, মস্তিষ্কের শক্তিতে অন্যদের থেকে আলাদা। একজনের দৈহিক শক্তি বেশি হতে পারে অন্য আরেকজনের মস্তিষ্কের ক্ষমতা বেশি হতে পারে। যদি আমরা সকলেই এক হতাম তাহলে অনৈক্য, অসাম্যের কথাই উঠত না। আমাদের শক্তি আছে, অন্ততঃ কিছু মস্তিষ্কে ক্ষমতা, কিছু পরিমাণে দৈহিক শক্তি রয়েছে এই গুলোই ভিন্নতার সৃষ্টি করে। সমান বা অভিন্নতার ধারণাটি তবু আমাদের মনকে নাড়া দেয়, হৃদয়কে স্পর্শ করে। আমরা সবাই মানুষ তবু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষ আবার কেউ কেউ নারী, কেউ কালো, কেউ বা ফর্সা, কিন্তু সবাই মানুষ, সকলেই একই মানবতার (humanity) বা মানব সম্প্রদায়ের অধীন। এইসব বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এক বিমূর্ত মানবতা (abstract humanity) রয়েছে, যা সকলের ক্ষেত্রে সাধারণ (common)। এটিকে হয়ত দেখা যায় না, এর ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয় না বা একে বাস্তবায়িত করা যায় না, তবু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে তা আছে। একমাত্র মানবতা সম্পর্কেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এটি সব মানুষের সাধারণ উপাদান (common element)। এই সামান্যীকৃত ঐক্যের মধ্যে দিয়েই একজন মানুষকে পুরুষ হিসেবে বা নারী হিসেবে দেখা যায়।

সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ কিছু অসাধারণ উক্তি করেছেন। তিনি বলেন—জগতের পরিকল্পনাই হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। মানুষ হিসেবে তুমি একটি প্রাণীর থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন কিন্তু একজন জীবন্ত সত্তা হিসেবে পুরুষ, নারী, প্রাণী, উদ্ভিদ সবাই এক এবং অস্তিত্বশীল হিসেবে তুমি, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক। সেই সর্বজনীন অস্তিত্বই হলেন ঈশ্বর, সমগ্র বিশ্বের পরিণামী ঐক্য। তাঁর মধ্যেই আমরা সকলে এক, একই সময়ে।

তবে প্রকাশের দিক থেকে এইসব প্রভেদগুলো সর্বদাই থাকে।

স্বামীজী এইরকম একটি ধর্মের প্রচার করতে চেয়েছিলেন যে ধর্ম সব মনের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে, এটি সমানভাবে দার্শনিকতাযুক্ত (philosophic), সমানভাবে আবেগীয়, সমানভাবে মরমী (mystic), সমানভাবে কর্মের উপযোগী (conducive)। এদের সমন্বয়ই হবে আদর্শ একটি সর্বজনীন ধর্মের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তিনি বলেন—'এই হল এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ সম্পর্কে আমার আদর্শ। উক্ত চারটি দিকের সঙ্গে সুসংহতভাবে সমন্বিত করাই আমার ধর্মের আদর্শ।' এই ধর্ম লাভ করা সম্ভব কিন্তু কিভাবে? স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষে যাকে আমরা যোগমিলন বলি তার দ্বারা। কার্মিক মানুষের কাছে মানুষ ও সমগ্র জাতির সঙ্গে, মরমীর কাছে তার নিজের ক্ষুদ্র সত্তা ও বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে, প্রেমিকের কাছে নিজের সঙ্গে ও প্রেমময় ঈশ্বরের সঙ্গে, দার্শনিকের কাছে এই মিলন প্রকৃতপক্ষে সব অস্তিত্বের মিলন। 'যোগ' বলতে আমরা একেই বুঝবো। মানুষের মন ও প্রবণতা অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে আবির্ভূত হয়। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই ওই চার ধরনের প্রধান মানুষের কথা বলা যায়। ধর্ম প্রত্যেক প্রকারের মানুষের কাছে একটি করে এমন পথ বা উপায় বলে দেবে যা প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাবের সঙ্গে উপযুক্ত হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগুলো এই রকম চারটি পথের দিশা দেখিয়েছিল যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। এইসব পথ স্বার্থপরকে স্বার্থহীনে রূপান্তরিত করে এবং পরম সত্যের সঙ্গে মিলনের দিকে বা যোগের দিকে এগিয়ে দেয়। বিবেকানন্দের মূলকথা হল—'এইসব যোগগুলোর অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য; তাদের নিছক মতবাদ বা তত্ত্ব হিসেবে গণ্য করলে কোন কাজে আসবে না। ধর্ম হল উপলব্ধি, বক্তৃতা নয়, মতবাদ হয়, তত্ত্ব নয় যতই সুন্দর তারা হোক না কেন। এটি সত্তা হওয়া নয়, শোনা বা স্বীকৃতি নয়, এটি হল যা সে বিশ্বাস করে তাতে তার সমগ্র আত্মার পরিবর্তিত হওয়া। এই হল ধর্ম।'

উক্ত বিভিন্ন মতবাদগুলো ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের পক্ষে কি করণীয় সে বিষয়ে বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আছে। তাহল প্রথমেই তাদের সম্বন্ধে শুনতে হবে, তারপর তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। ওইসব চিন্তা, বিচার-বিবেচনা করতে হবে, আমাদের মনের উপর তাদের প্রবেশ করতে হবে, তাদের উপর ধ্যান করতে হবে, তাদের উপলব্ধি করতে হবে, যতক্ষণ না তারা আমাদের সমগ্র জীবনে অঙ্গীভূত হতে পারছে।

পরিশেষে, বিবেকানন্দ সানফ্রান্সিসকোতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা বিতর্কের জন্ম দিলেও তা উল্লেখযোগ্য—প্রতিটি ধর্মই নিজেকে সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে দাবী করে, কিন্তু আমার প্রথমেই মনে হয় সম্ভবতঃ এইরকম একটি ধর্ম থাকা কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু যদি একটি ধর্ম সত্যই থাকে, যে এই দাবী করতে পারে তাহলে তা হবে কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম, অন্য কোন ধর্ম নয়, কেননা অন্যান্য সব ধর্মই কোন না কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে আছে। কিন্তু আমাদের ধর্ম কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে না। এটি নীতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিশ্বজনীন ধর্ম ও সেই ধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনার শেষে দু-একটি কথা উল্লেখ করা

প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। অনেক চিন্তাবিদ্‌ই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধন করে বিশ্বজনীন ধর্ম নামে এক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বিশ্বজনীন ধর্ম মানে সব ধর্মকে এক করে ফেলা নয়। বিভিন্ন ধর্মের ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করা যায় না। যে সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন ধর্মকে বিবেকানন্দ আদর্শ হিসেবে গণ্য করেছিলেন তা আসলে ওইসব ভিন্নতা ও বৈচিত্রকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের মিলনের পথ প্রশস্ত করা। এই ধর্ম আধুনিক কালে সৃষ্ট নয়, ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্য মেনে তা আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ হল উদার। কোন ধর্মকে ছোট না করে নিজের ধর্মকে উচ্চাসনে বসানো নয়, বরং সব ধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখা, অন্য ধর্মকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করা হবে এই ধর্মের আদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষকেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমান বলে বিবেচনা করা বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রভেদ হল পন্থাগত। মূলগত সত্য সব ধর্মেরই এক, তাদের লক্ষ্যও এক, তাই, বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ হল পৃথিবীর সব মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধা, সব ধর্মের সত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে সেই বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ব্যবহারিক বেদান্ত
(Practical Vedanta)

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের১০ই নভেম্বর লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর ব্যবহারিক বেদান্ত সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা তুলে ধরেছেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছেন—'আমাকে বেদান্ত দর্শনের ব্যবহারিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হয়েছে। আমি আপনাদের বলেছি তত্ত্ব হিসেবে এটা খুবই ভালো, কিন্তু কীভাবে একে আমরা অনুশীলন করব? যদি এবিষয় সম্পূর্ণ অব্যবহারযোগ্য হয়, তাহলে বৌদ্ধিক চর্চা ছাড়া কোন তত্ত্বেরই মূল্য থাকে না। সুতরাং ধর্ম হিসেবে বেদান্তকে অবশ্যই গভীরভাবে ব্যবহারিক হতে হবে।' এই বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ এক নব বেদান্ত বা বেদান্তের নব রূপ প্রবর্তন করতে চাইছেন যেটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চালনা করতে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে। ধর্ম ও জাগতিক জীবনে অলীক ও অবাস্তব ভিন্নতাগুলো অবশ্যই দূর করতে হবে। কারণ বেদান্ত আমাদের একত্বের—এক ও অভিন্ন জীবনের শিক্ষা দেয়। ধর্মের আদর্শগুলো যেন আমরা সর্বক্ষেত্রে আমাদের জীবনব্যাপী বেষ্টিত করে রাখি; আমাদের যাবতীয় চিন্তায়, সকল কর্মে অনুশীলনে এগুলি যেন প্রবেশ করতে পারে। বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় বলেছেন—'...আমি ভারতের যে দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি, তার নাম বেদান্ত দর্শন। এটি খুবই প্রাচীন দর্শন এবং এর কিছু অভিনবত্ব আছে। এই দর্শন প্রাচীন আর্য সাহিত্যের বিপুল ভান্ডারের ফলশ্রুতি যার নাম বেদ। বেদ

সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক, কোন ব্যক্তি বা ধর্ম প্রচারের দ্বারা এটা জন্ম নেয়নি, কোন একজন মানুষকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত করে গঠিত হয়নি। যে সকল দর্শন সম্প্রদায় কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে এর কিছু বলার নেই। তবে একটি মাত্র নীতি উপস্থাপন করে বেদান্তের দাবী হল—মানুষ ঐশ্বরিক, আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি তা সেই ঐশ্বরিক চেতনারই ফলশ্রুতি...।'

স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'কার্যে পরিণত বেদান্ত' নামক প্রবন্ধে বলেছেন— 'স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব ও পূর্ণত্বকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবনবেদ ও সামাজিক পরিকল্পনা বা কার্যে পরিণত বেদান্তের কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন'। প্রশ্ন উঠতে পারে অদ্বৈত বেদান্তের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শঙ্করাচার্যের বেদান্তের সঙ্গে বিবেকানন্দের এই বেদান্তের মধ্যে পার্থক্য কি? উত্তরে বলা হয়েছে 'শঙ্করাচার্য্য যেখানে তত্ত্বকে বিশুদ্ধ রূপে নিষ্কাশিত করিয়া দেখাইতে বদ্ধপরিকর, স্বামীজী সেখানে সেই তত্ত্বকে সর্বানুস্যূত রূপে দেখিয়া কার্যে প্রয়োগ করিতে কৃতসংকল্প। আচার্য (শংকর) যেখানে প্রতি পদে কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ দেখাইতেছেন, স্বামীজী সেখানে কার্যক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়-স্থাপনে যত্নপর। আচার্যের দৃষ্টিতে জ্ঞানের রূপটি যেখানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত স্বয়ং ব্রহ্ম, স্বামীজীর দৃষ্টিতে সেখানে উহা মানবের উন্নতিপথের পথনিদর্শক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ'। বিবেকানন্দ প্রচারিত এই বেদান্ত নর-নারায়ণ সেবার আকর। মানবজাতির মঙ্গল বা উন্নতির জন্য তিনি যে পথনির্দেশ করেছিলেন তাও কিন্তু এই অদ্বৈতভূমির উপর দাড়িয়ে আছে। তাঁর 'গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-ও তাঁহাকে সযত্নে অদ্বৈত মতে উপদেশ দিলেন এবং স্বয়ং অদ্বৈতের শেষ সীমা নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হইয়া ঘোষণা করিলেন, "অদ্বৈত সব শেষের কথা", অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা-ই কর'। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতানুভূতি ও ব্যবহারিক ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখতেন না।[১] বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতার আর এক জায়গায় বলেছেন— 'প্রত্যেক জোরালো, ভালো এবং শক্তিশালী বিষয় যা মানব প্রকৃতিতে অস্তিত্বশীল এবং বেশকিছু ক্ষেত্রে সুপ্ত, তা ওই দেবত্বেরই ফলশ্রুতি; মনুষ্যসত্তার মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই, সব সত্তাই মূলত একইভাবে ঐশ্বরিক। সেখানে যেন এর পিছনে এক অসীম সমুদ্র রয়েছে যার ঢেউ হলাম আমরা, এবং আমরা প্রত্যেকে আপ্রাণ চেষ্টা করছি সেই অসীমকে বাইরে প্রকাশ করতে। সুতরাং সুপ্তভাবে আমরা প্রত্যেকে অস্তিত্বের, জ্ঞানের এবং আনন্দের অসীম সমুদ্রে আছি যা আমাদের জন্মগত অধিকার, আমাদের যথার্থ স্বরূপ।আমাদের মধ্যে ভিন্নতার কারণ ঘটে সেই দেবত্বকে প্রকাশ করার বেশী বা কম শক্তির জন্য।...বেদান্তের সেই সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন অসূয়া নেই যারা মানুষের এই ঈশ্বরত্বের বিষয়টি বুঝতে পারে না। সচেতন বা অচেতনভাবে প্রতিটি মানুষ সেই ঈশ্বরত্বকে প্রকাশ করতে চাইছে'।

বিবেকানন্দ বলেন, বেদান্ত দাবী করে যে, কোন একটি ধর্মীয় অনুপ্রেরণা যতই বড় হোক না কেন তা ঐশ্বরিক মানবের কোন একক প্রকাশ নয়, তা মানব প্রকৃতির মধ্যে অসীম

১। কার্যে পরিণত বেদান্ত—স্বামী গম্ভীরানন্দ; পৃঃ ১৩০।

একত্বের প্রকাশ, আমরা সবাই যাকে নৈতিকতা বলি; যা আমাদের যাবতীয় নৈতিকতার ভিত্তি। অন্যের মঙ্গল বা ভাল করাও এই একত্বের প্রকাশ। এই একত্বের প্রকাশকে আমরা প্রেম, সহানুভূতি বলি। বেদান্তে তাই বলা হয়েছে 'ত্বৎ তম,তত্ত্ব মসি'—'যা আমি,তুমি সেই'। প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয় যে, সে এই বিশ্বসত্তার সহিত এক ও অভিন্ন। তাই যত আত্মা আছে সব তোমারই আত্মা, যত জীবদেহ আছে সব তোমারই দেহ। কাহাকেও আঘাত করার অর্থ হল নিজেকেই আঘাত করা এবং কাহাকেও ভালোবাসার অর্থ হল নিজেকে ভালোবাসা। তোমার অন্তর হইতে প্রেম নির্গত হইলে প্রতিদানে তুমিও প্রেম পাইবে, কারণ আমিই বিশ্ব-সমগ্র, বিশ্ব আমারই দেহ। আমিই অসীম। তবে সম্প্রতি আমার সে অনুভূতি নাই। কিন্তু আমি সেই অসীমতার অনুভূতির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং যখন আমার সেই অসীমতার পূর্ণ চেতনা জাগরিত হইবে তখন আমার পূর্ণতা প্রাপ্তিও ঘটিবে।[১] ব্রহ্মের সর্বব্যাপীত্ব ও ভূমাত্ব নানাভাবে ও বিভিন্ন শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। বেদান্ত এই বক্তব্য মেনে নিয়েছে। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মের উপাসনার সাহায্যে সর্বত্র নিজের অনুভূতির কথা উপনিষদে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এসব কথা শুধু জানলেই চলবে না, শাস্ত্রের লেখার কোন মূল্য নেই। এগুলো আমাদের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধি করতে হবে এবং তা কার্যে পরিণত করতে হবে। তবেই এর সার্থকতা। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'কার্যে পরিণত বেদান্ত' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—'অদ্বৈত ভাব পরম্পরার ক্ষেত্রেও এমন কয়েকটি স্থল আছে যেখানে সিদ্ধের জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির একই সঙ্গে বিকাশ অন্তত ব্যবহারিক দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে এবং সাধকের জীবনে উহা সজ্ঞানে গৃহীত হইয়া থাকে। আর সহজেই মনে হয় অদ্বৈতবাদী স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ ক্রিয়া করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মতে এই সক্রিয় অদ্বৈতবাদই সর্বপ্রকার ধর্ম নীতি ও সমাজ ব্যবস্থার মূল এবং অটুট ভিত্তি হইতে পারে। আর কোন মতবাদের মধ্যে সেরূপ সার্বভৌমিক উদার দৃষ্টি এবং সত্যের প্রতি অবিচল অভিযানের জন্য আহ্বান পাওয়া যায় না। সিদ্ধির স্থিরতার সহিত সাধনার অবিরাম অগ্রগতি একমাত্র অদ্বৈতের মধ্যে নিহিত আছে'।[২]

স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তে যে সাধনার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এক সুষম সমন্বয়ে সমন্বিত এক অবিচ্ছেদ্য রূপে বিধৃত। সমস্ত জীবের মধ্যে চৈতন্যরূপী ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন এবং সেই অনুসারে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ মন্তব্য করেছেন "সর্বত্র আপনার সহিত অভিন্ন ব্রহ্মদর্শনের ভিত্তিতে জ্ঞানভক্তির এই মিলন বিবেকানন্দের নরনারায়ণসেবাকে কর্মযোগ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কর্মযোগে উল্লেখ করিয়াছেন যে কর্তৃত্ব-বুদ্ধি ও ফলাকাঙ্খা না থাকিলেই কর্মযোগী বলা চলে,তজ্জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস অত্যাবশ্যক নহে।"[৩]

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা- অষ্টম খণ্ড; পৃ: ৩৮-৩৯।
২। কার্যে পরিণত বেদান্ত; পৃঃ-১৩২-১৩৩।
৩। তদেব; পৃঃ-১৩৭।

গীতাতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে, 'তুমি যা কিছু করো, তা সে ভোজন, হোম, দান, তপস্যা যাই হোক না কেন তা আমাতে সমর্পণ করো'। আরো বলা হয়েছে যে, 'কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করে যে ব্যক্তি কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করেন, তিনি বাস্তবিকই একজন সন্ন্যাসী ও যোগী'। বিবেকানন্দের 'দৃষ্টির সম্মুখে কিন্তু আছে সর্বপ্রাণী এবং সর্বকর্ম, আর যেখানে শুধু ঈশ্বরে ফলার্পণ নয়, পরন্তু যাহাদের সেবা করিতেছি তাহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর রূপে সম্মুখে বিদ্যমান, আবার সেবক নিজেও ব্রহ্ম। এখানে কর্তা ব্রহ্ম, উপাদান ব্রহ্ম, দাতা ব্রহ্ম, গৃহীতা ব্রহ্ম, কর্ম ব্রহ্ম, ফলও ব্রহ্ম'।

বেদান্ত অদ্বৈত তত্ত্ব প্রচার করে অর্থাৎ 'সর্বভূতে একই আত্মা'; এই হল এর অন্যতম প্রধান তত্ত্ব। কিন্তু সাধনা বা অনুশীলন না থাকলে একে উপলব্ধি করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ এই তত্ত্বজ্ঞানে সব মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন। "অতীতে ভাবা হতো যে, যারা বেদান্ত তত্ত্বের বিচার করবেন বা বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞানের সাধনা করবেন তারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে এরকম সাধনা করবেন। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন ঃ এই বেদান্তকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও লাগাতে হবে।ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার দরকার নেই। যাঁরা বেদান্ত তত্ত্বের বিচার করবেন তাঁরা কর্মকেই সেই দৃষ্টিতে কাজে লাগাবেন। যোদ্ধা যুদ্ধ করুক, ব্যবসায়ী ব্যবসা করুক, কৃষক জমি চাষ করুক। কিন্তু তারা যেন সকলেই নিজের নিজের কর্মকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে অনুষ্ঠান করে। অর্থাৎ গাড়ি ব্রহ্ম, চালক ব্রহ্ম, চালনক্রিয়া ব্রহ্ম- এরকম চিন্তা করেই কাজ করতে হবে। অথবা সকল জীবকে শিব বা ব্রহ্ম বুদ্ধিতে সেবা করতে হবে। এরকম দৃষ্টিতে কর্ম করলে সেই কর্ম আর বন্ধনের কারণ হবে না, বরং জ্ঞানের উৎপাদন দ্বারা মুক্তির কারণ হবে। '...বেদান্ত যদি ধর্মের আসন গ্রহণ করিতে চায় তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে।...শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে।'[১]

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন—"...কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে উহাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম।... কর্মে পরিণত বেদান্ত (practical advaitism) যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই।"[২]

স্বামীজী সারা পৃথিবীতে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে যে ধর্ম ও নীতির প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার প্রেরণাস্বরূপ ছিল তাঁর অদ্বৈত বেদান্ত তত্ত্ব। তিনি সকলকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, নিজের আত্মার সঙ্গে সব জীবাত্মার এবং সব জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে একত্ব রয়েছে এই বোধ জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন, তা না হলে জীবের কল্যাণসাধন সম্ভব নয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল সমস্ত নীতিনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, যাবতীয় প্রেম, দয়া, করুণা—সবই ওই একত্বের বোধ থেকে জন্মায়। স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিখ্যাত

১। স্বামী বিবেকানন্দের নববেদান্ত—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য; পৃঃ-১৮২।
২। স্বামীজীর বাণী ও রচনা—অষ্টম খণ্ড; পৃঃ-৩৯।

উক্তি—'অদ্বৈতবাদ, কেবল অদ্বৈতবাদের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে।...অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে, অপরকে হিংসা করিতে গিয়া তুমি নিজেকেই হিংসা করিতেছ কারণ তাহারা সকলেই যে তুমি। তুমি জান আর নাই জানো, সকল হাত দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সকল পা দিয়া তুমি চলিতেছ, তুমিই রাজারূপে প্রাসাদে সুখসম্ভোগ করিতেছ; আবার তুমিই রাস্তার ভিখারীরূপে দুঃখের জীবনযাপন করিতেছ। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হও। যেহেতু অপরকে হিংসা করিলে নিজেকেই হিংসা করা হয়, সেইজন্যই কখনও অপরকে হিংসা করা উচিত নহে।... কাজেই দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা; অন্যান্য মতবাদ তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, ইহার কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারে না।... একমাত্র অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।'[১]

'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' নামক গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করে বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বোঝানো যায়—'এই ব্রহ্ম যদি এক হন এবং তাঁর প্রকাশের ভঙ্গি যদি বিচিত্র ও রূপ যদি বিভিন্ন হয় তবে বিবাদের স্থান কোথায়? একত্বের ভূমিতে স্থাপিত বৈচিত্র অবলম্বনে তিনি জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে এক মনুষ্য সমাজ স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন।'[২]

বিবেকানন্দ মনে করতেন যে অদ্বৈতবাদকে সব নীতির শ্রেষ্ঠ ভিত্তি বলে গণ্য করা যায়। স্বামী গম্ভীরানন্দ দেখিয়েছেন যে, 'শুধু অপর মতকে সহ্য করাই যথেষ্ট নহে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশও আবশ্যক। এই অদ্বৈত ভিত্তির উপর সর্বধর্ম-সমন্বয়কে সু-প্রতিষ্ঠিত করিয়াও তিনি ভক্তি, জ্ঞান, যোগ, কর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম প্রকাশ সম্বন্ধে ঔদার্য ও শ্রদ্ধা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ইহাই বলিয়াছিলেন যে, অদ্বৈত অবলম্বনেই সর্বপ্রকার বিবাদ-নিষ্পত্তি সম্ভবপর।'[৩]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, 'ব্যবহারিক বেদান্ত' কোন নতুন শাস্ত্র বা দর্শন নয়। এর বৈশিষ্ট্য বেদান্তের সনাতন তত্ত্বকে শুধু নতুনরূপে উপস্থাপন নয়, তার সঙ্গে তাকে কর্মেও রূপান্তরিত করা। বেদান্তের জীব ও ব্রহ্মের একত্বকে নিজের কর্মের মধ্য দিয়ে কেবল উপলব্ধি করলে হবে না, তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এখানেই কর্মযোগের গুরুত্ব। তত্ত্বকে কীভাবে ব্যবহারিকক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ব্যবহারিক বেদান্তে অদ্বৈততত্ত্ব ও কর্মযোগের এক অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। মানবপ্রেমী বিবেকানন্দ মানুষের মঙ্গল বা কল্যাণেই ব্যবহারিক বেদান্তের সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা যা বেদান্ত প্রচার করে তাকে কর্মে পরিণত

১। তদেব; পঞ্চম খণ্ড; পৃঃ-৩৩১-৩৩৫।

২। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ; স্বামী গম্ভীরানন্দ; পৃঃ-১৩২-১৩৩।

৩। তদেব; পৃঃ-১৪২।

করতে না পারলে এই মহান ও উচ্চ আদর্শ এক বৌদ্ধিক ব্যায়ামে পরিণত হবে। বিবেকানন্দ তাঁর ব্যবহারিক বেদান্তে এই আদর্শের বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সব কিছুকে ব্রহ্ম বিবেচনা করে কর্ম করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। সাধনা ছাড়া ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা কঠিন, আর এর জন্য সবার আগে প্রয়োজন। ত্যাগ, বৈরাগ্য, পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থ সেবা ও প্রেমের অনুশীলন। 'তত্ত্বমসি'র এই বৈদান্তিক তত্ত্বকে জীবনে প্রয়োগ করাই ব্যবহারিক বেদান্তের তাৎপর্য। জীব ও ব্রহ্মের তাদাত্ম্য উপলব্ধি করা সাধন সাপেক্ষ; এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। বিবেকানন্দ তাই গর্বের সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন যে, আমাদের ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে নীতির উপর। এর মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের স্থান। তিনি বলেন আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের ধর্মের এইসব নিরাপদ নীতিগুলোকে নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের সকলের জীবনের চালিকা শক্তিকে সচেতন রাখতে হবে ও সর্বোপরি এটিতে যুগের ধূলা-আবর্জনা জমা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এটি বিস্ময়ের যে বেদান্তের এইসব নীতিগুলো কখনও কলঙ্কিত হয়নি। কেউ এদের উপর কালিমা লেপন করার সাহস দেখাতে পারে নি।

অনুশীলনী

১। স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

২। ধর্মের স্বরূপ বিবেকানন্দ কীভাবে তুলে ধরেছেন?

৩। বিশ্বজনীন ধর্ম বলতে কী বোঝায়? এই ধর্মের দর্শন বিবেকানন্দ কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? আলোচনা করো।

৪। স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে ব্যবহারিক বেদান্তের পরিচয় দাও।

৫। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো ঃ

(ক) মানুষের ভৌত প্রকৃতি

(খ) মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি

(গ) সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ

(ঘ) বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্মের আদর্শ।